নবী পরশমণি

খুতবাতে মাদ্রাজ-এর বঙ্গানুবাদ

নবী পরশমণি

নবীচরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মাদ্রাজের লালি হলে
১৯২৫ সালে প্রদত্ত আটটি সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতার সংকলন

মূল

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী

প্রথম সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়তুল মুদাররিসিন ও সদস্য,
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড (১৯৭২)
সদস্য, ইসলামী বিশ্বকোষ ও সিরাত বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের অন্যতম শহীদ 'স্বতন্ত্র ধর্ম-দফতর' প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, সুপণ্ডিত, বাগ্মী ও সুলেখক 'তাজুল মুফাসসিরীন' হযরত মাওলানা অলিউর রহমান সাহেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে– যিনি আমার সাহিত্যচর্চার প্রধান উৎসাহদাতারূপে আজীবন আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

বিনয়াবনত
আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে আমার যৌবনের শুরুতে অনূদিত আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ.-এর যুগান্তকারী *খুতবাতে মাদ্রাজ* নামে গোটা উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নবী-চরিতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণধর্মী বিখ্যাত এ ভাষণগুলোর অনুবাদ আমি সম্পন্ন করে তদানীন্তন *ইসলামি একাডেমি* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশও করেছিলাম। জনাব আবুল হাশিমের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি এবং অধ্যাপক শাহেদ আলীর মতো নন্দিত কথাসাহিত্যিকের হাত গলিয়ে এগুলো প্রকাশিত হওয়ায় এগুলোর অনুবাদের মান যে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মুহতারাম উস্তাদ মাওলানা উবায়দুল হক রহ. [পরবর্তী সময়ে জাতীয় মসজিদের খতিব] হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী, ড. মুহাম্মদ এছহাক রহ.-এর মতো বুজুর্গগণের দোয়ার বরকতে গ্রন্থটি খুবই জনপ্রিয়ও হয়েছিল। বাংলা ভাষা চর্চার সেরা জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমিও এ উন্নতমানের গ্রন্থটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তখনো যেহেতু লেখকের মৃত্যুর ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়নি, তাই মূল লেখকের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া আইনত জরুরি ছিল। সে সুযোগের অভাবে তারা তখন তা প্রকাশ করতে পারেননি।

বুক সোসাইটি বাংলাবাজারের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে প্রথম পুস্তকাকারে তা প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকাশক দেওয়ান মুস্তফা কামাল তার আরও ২-৩টি সংস্করণ প্রকাশ করার পর তাঁর ইনতেকালে প্রকাশনাটি বন্ধ হয়ে যায়– যে কারণে আমার এ বইটি এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের প্রসিদ্ধ *ইনসানিয়াত মউত কে দরওয়াজে পর*-এর আমার অনুবাদ *জীবন সন্ধ্যায় মানবতা* এবং তাঁর বিখ্যাত *ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম*-এর অনুবাদ ও প্রতিভাষ্য *ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিলো*-এর মতো পাঠকপ্রিয় পুস্তকগুলোও বাজার থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এই ফাঁকে এ পুস্তকসহ ওই পুস্তকগুলোর একাধিক নতুন অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে সে স্থান পূরণের চেষ্টা করে। সে প্রচেষ্টাগুলো কতটুকু সফল হয়েছিল, তা পাঠকই ভালো বলতে পারবেন। তবে শর্ষিনা দারুসসুন্নাহ আলিয়া মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা শরীফ

আবদুল কাদের মরহুম নানা কারণে আমার এ অনুবাদটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন।

আমার এই অনুবাদগ্রন্থটি সম্পর্কে একটি স্মরণীয় মধুর স্মৃতি হচ্ছে, জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী যখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ছিলেন তখন সেই ’৯০-এর দশকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষকালব্যাপী সিরাতুন নবী অনুষ্ঠানের এই পুস্তকটির আবৃত্তিভিত্তিক একটি বিশেষ অধিবেশন বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসংলগ্ন ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছিল। তখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা পরিচালক ছিলেন জনাব লুৎফুল হক। আমি নিজেও সে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম এবং অনুবাদক হিসাবে তাতে বক্তৃতা করতেও অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। হলে পিনপতন নীরবতা ছিল। তিন ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠান চলাকালে একজন শ্রোতাও হল ত্যাগ করেননি। তা দেখে ওই বিজ্ঞ মহাপরিচালক মন্তব্য করেন যে আমাদের পনেরো দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার এটিই হচ্ছে সফলতম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই পুস্তকটি কিনতে চান কিন্তু সে পুস্তকটি তো আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ছিল না, তাই শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তকটির কপি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

অপর গ্রন্থটি *ভারত যখন স্বাধীন হল* শিরোনামে প্রকাশকারী প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুত তাকওয়া শেষ পর্যন্ত তা বাদ দিয়ে আমার অনূদিত *ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল* প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার অনূদিত *জীবনসন্ধ্যায় মানবতা* বছর দুয়েক আগে রাহনুমা প্রকাশনী পুনরায় বাজারজাত করে ইতিমধ্যে এর দুটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

আশা করি, আমার বড় ছেলে মাসউদ আবদুল্লাহ এবং প্রকাশনা সংস্থা ইত্তিহাদ-এর স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাকের আগ্রহে *খুতবাতে মাদ্রাজ*-এর অনুবাদের ‘নবী পরশমণি’ শিরোনামে প্রকাশিত এ সংস্করণটি আবার পাঠকদের আনন্দের কারণ হবে। দোয়া করি, আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য সফল করুন।

দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের কপিটি সরবরাহের জন্য সিলেটের বিখ্যাত কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

খাকসার

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

ইউ/১১ নুরজাহান রোড, ব্লক-ডি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আখেরি চাহার শম্বা ১৪৪২, ১৪ অক্টোবর ২০২০

পরিচিতি

বিগত দশকের গোড়ার দিকে প্রখ্যাত উর্দু কবি নাঈম সিদ্দিকি তাঁর উর্দু মাসিক *সাইয়্যারা* পত্রিকার একটি বিশেষ 'অধ্যয়ন-সংখ্যা' প্রকাশ করেন। তাতে গোটা উপমহাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং রুচিমান পড়ুয়াদের কতিপয় প্রশ্ন ও এর উত্তর প্রকাশিত হয়। প্রশ্নগুলো যে অধ্যয়ন সম্পর্কেই ছিল, তা বলাই বাহুল্য, তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল–আপনার মতে উর্দু ভাষার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক কোনটি? উত্তরদাতাদের অনেকেই আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবীর *খুতবাতে মাদ্রাজ*-এর নাম বিশেষ গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন। এ প্রশংসাসূচক উত্তরদাতাদের মধ্যে তদানীন্তন পূর্বপাক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমাদের জাস্টিস সাইয়েদ মহবুব মুর্শিদ মরহুমও ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের ইসলামি শিক্ষা সংস্থার উদ্যোগে আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ. ১৯২৫ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মাদ্রাজের লালি হলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আটটি উচ্চ গবেষণামূলক লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণগুলো ১৯২৬ সালে *খুতবাতে মাদ্রাজ* বা *মাদ্রাজের বক্তৃতামালা* নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী তাঁর উস্তাদ প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, গবেষক ও বহু মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা মাওলানা শিবলি নুমানিসহযোগে ছয় খণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত *সিরাতের ুন নবী* গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্বয়ং গ্রন্থকারের মতে, *খুতবাতে মাদ্রাজ* এই *সিরাতুন নবী*রই সারনির্যাস। বস্তুত বইটিতে সমুদ্রকে কৌটার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খ্যাতনামা চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক ড. রশীদ আহমদ সিদ্দিকী তাঁর এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে আল্লামা নদবীর যে বইখানি তাঁর মনে সর্বাধিক দাগ কেটেছে, তা এই *খুতবাতে মাদ্রাজ*, যার বঙ্গানুবাদ পাঠকের কাছে *নবী চিরন্তন* (বর্তমান *নবী পরশমণি*) নামে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, নবীচরিত এবং ইসলামি ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এমন সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বই পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় লেখা হয়েছে কি না, তাঁর জানা নেই।

তাঁর মূল পুস্তকের ভূমিকায় সেই ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই লেখক আশা প্রকাশ করেছিলেন যে মাদ্রাজের এই বক্তৃতা সিরিজ ইউরোপের বিখ্যাত বক্তৃতা সিরিজের মতোই খ্যাতি অর্জন করবে। পরবর্তী বছরগুলোতে ড. স্যার মুহাম্মদ ইকবাল এবং কুরআন শরিফের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক মার্মাডিউক

পিকথলের মতো খ্যাতিমান পণ্ডিতগণও এ সিরিজে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তাঁদের বক্তৃতাগুলোও যথাক্রমে *Reconstruction of the Religious Thought in Islam* এবং *Islamic Culture* শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু এ সিরিজের উদ্বোধনকারী বক্তা আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবীর বক্তৃতামালা *খুতবাতে মাদ্রাজ* দেশে-বিদেশে যে বিপুল খ্যাতি অর্জন করে, তার তুলনা হয় না। উপমহাদেশের অসংখ্য প্রকাশনা থেকে এই বইটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর দ্বারাই পুস্তকের মান ও মূল্য সহজেই অনুমান করা যায়।

খুতবাতে মাদ্রাজ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের পাঠকের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্কুল-মাদরাসা, মজলিস-মাহফিলে তা পঠিত হতে থাকে। তা ছাড়া বইটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়, যেমন ইংরেজি, গুজরাটি, পশতু ও তুর্কি। *খুতবাতে মাদ্রাজ*-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান ঢাকার ভারপ্রাপ্ত বার্তাসম্পাদক জনাব সাঈদুল হক এবং লেখকের ইচ্ছানুসারে অনুবাদটির নাম রাখেন *The Living Prophet*। আল্লামা নিজেই নাকি বলতেন এ বইটি তাঁর জীবনের সর্বাধিক স্মরণীয় কীর্তি। তিনি আরও বলতেন, এ বক্তৃতাগুলো অনুপম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও উচ্চাঙ্গের হওয়ার কারণ হচ্ছে এগুলো আমি পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখা অবস্থায় লিখেছিলাম।

এই মূল্যবান বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী বাংলাসাহিত্যে একটি নবতর সংযোজন করলেন। তাঁর অনুবাদের প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর মৌলিক রচনাবলি এবং অনুবাদ পড়ার সুযোগ আমার প্রায়ই হয়ে থাকে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে, যোগ্য লেখকের রচনা যোগ্যতাসম্পন্ন অনুবাদকের হাতেই অনূদিত হয়েছে। আমি তাঁকে এ জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লামা নদবী এবং আল্লামা শিবলির অমূল্য রচনাসম্ভার বাংলায় ভাষান্তরিত করলে আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারের একটি অতি প্রয়োজনীয় অভাব দূরীভূত হতে পারে। এদিকে আমি অনুবাদক ও সুধী প্রকাশকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিশ্বাস, 'বুক সোসাইটি' এ ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিশেষে আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

তারিখ : ১৮ মার্চ, ১৯৭৫, ঢাকা।

মুহাম্মদ এছহাক
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুবাদকের কথা

সে ১৯৬৬ সালের কথা। আমি তখন ঢাকা আলিয়া মাদরাসার কামিল হাদিসের শেষ বর্ষের ছাত্র। মাদরাসা ছুটির অব্যবহিত পরেই আসরের নামাজ ও বৈকালিক চা-নাশতা কোনোমতে সেরেই ছুটতাম কলেজে। রাত ১০টার দিকে কলেজ থেকে ফিরলেও এশার নামাজ ও খাওয়াদাওয়া এবং দৈনন্দিন কর্মসূচির অন্যান্য কাজকর্ম সেরে শয্যা গ্রহণ করতে-না-করতে প্রায়ই ঘড়ির কাঁটা ইংরেজি ক্যালেন্ডারের নতুন দিনের সীমায় প্রবেশ করত। তার উপর 'পূর্ব-পাক জমিয় তোলাবায়ে আরাবিয়া' (মাদরাসা ছাত্রসংগঠন) এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সংগঠন ছাত্রনেতা হিসেবেও ছিল আমার উপর বিরাট দায়িত্ব। এত সবের পর সাহিত্যচর্চা বা অন্য কিছু করার অবকাশ আমার ছিল কোথায়? তাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী সাহেব যখন আমাকে *খুতবাতে মাদ্রাজ* অনুবাদ করতে বললেন আর লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার প্রিন্সিপাল আলেমকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. তাঁর মাদরাসা লাইব্রেরি থেকে আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবীর ওই বইটি অনুবাদের জন্য দিয়ে দিলেন, তখন থেকে শুরু করে প্রায় দেড় বছর সময় লেগে যায় আমার এ বইটি অনুবাদ করতে। একে তো বইটি হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের (জীবনাদর্শ) সংক্রান্ত, তার উপর আমার দুজন পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বি আমাকে এ জন্য আদেশ দিয়েছেন, তাই দায়সারা গোছে এ কাজ সম্পন্ন করতে আমার মন চাইল না। আর ইচ্ছে করলেও এমনতরো ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিকসুলভ উচ্চ ভাবের বইয়ের অনুবাদ তড়িঘড়ি করে করা কোনো দায়িত্বশীল অনুবাদকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

আল্লাহর লাখ লাখ শোকর, মূল বইয়ের ন্যায় এই অনুবাদটির প্রতিও জ্ঞানী-গুণীদের অত্যন্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় এবং অনুবাদের কাজ চলাকালেই *ইসলামিক একাডেমি পত্রিকা*, *দৈনিক আজাদ*, *মাসিক মদিনা*সহ বিভিন্ন সাময়িকীতে এর বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হতে থাকে। *ইসলামিক একাডেমি* পত্রিকায় এর প্রায় সবটাই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এমনকি বাংলা একাডেমিতেও বইটি পরম যত্নসহকারে সানন্দে প্রকাশের যোগ্য

বিবেচিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি আনুষ্ঠানিক অসুবিধার জন্য পাণ্ডুলিপিটি আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে পুস্তকাকারে তা প্রকাশের জন্য অবিরত তাগাদা আসতেই থাকে। ইচ্ছে ছিল, নিজেই পাবলিকেশন খুলে বইটি প্রকাশ করব, তাই তারপর আর কোনো প্রকাশকের পাশ মাড়াইনি। কিন্তু সে প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে সত্য সত্যই যখন প্রকাশকের দ্বারস্থ হলাম তখন সরেজমিনে লক্ষ করলাম, আগ্রহী গুণগ্রাহী পাঠক এবং ব্যবসায়ী প্রকাশকের মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান! বিশেষত লেখক যদি প্রথমবারের মতো প্রকাশকের দোরগোড়ায় পা দেন। কেননা, দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের প্রকাশকদের অধিকাংশই পাঠক নন। তাঁরা নিছক ব্যবসায়ী। পুস্তকের গুণ-মান নির্ধারণে তাঁদের কাছে একটিমাত্র মাপকাঠি রয়েছে, আর তা হলো কত অল্প সময়ের মধ্যে বইটির কত অধিক কাটতি হতে পারে আর তা থেকে কত অধিক মুনাফা আসবে।

'বুক সোসাইটি'র স্বত্বাধিকারী জনাব মোস্তাফা কামালের মধ্যে আমি তার অনেকটা ব্যতিক্রম লক্ষ করেছি। তিনি নিজে সমঝদার পাঠক এবং সাহিত্যরসিক। তাই পরের মুখে ঝাল খাওয়ার চেয়ে নিজেই তিনি পাণ্ডুলিপি পড়ে বইয়ের গুণাগুণ বিচার করেন। শুধু ব্যবসায়ী দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, মানগত দিক থেকেও। *মাসিক মদীনা*র সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের পরামর্শে আমি *নবী চিরন্তন*-এর পাণ্ডুলিপিখানা–ঠিক পাণ্ডুলিপি নয়, পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত কাটিংগুলো আমি তাঁকে দেখাই। একনজর দেখেই তিনি বইটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রথমে আমি *খুতবাতে মাদ্রাজ*-এর এ অনুবাদের নামকরণ করতে চেয়েছিলাম 'শাশ্বত নবী : চিরন্তন পয়গাম'। এমন সময় বইটির ইংরেজি অনুবাদ *The Living Prophet* বইটি আমার নজরে পড়ে। ইংরেজি অনুবাদক জনাব সাঈদুল হক তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে মূল গ্রন্থকারই নাকি তাঁকে এ ইংরেজি নামটি নির্বাচন করে দিয়েছেন, বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় 'চিরঞ্জীব নবী'। উর্দুতে 'জিন্দা নবী' জাতীয় যৌগিক শব্দের প্রচলন থাকলেও বাংলায় এমন একটি নাম আবার নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি চিরঞ্জীব শব্দের স্থলে শাশ্বত বা চিরন্তন শব্দ ব্যবহার করতে চাই। অনেক চিন্তাভাবনার পর শেষ পর্যন্ত এ বইটির নাম *নবী চিরন্তন* সাব্যস্ত হয়।

বইটি প্রকাশের শুভ মুহূর্তে আমি অবশ্যই প্রকাশকসহ উল্লিখিত মনীষীদের ঋণ স্বীকার করব। এ প্রসঙ্গে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*-এর লেখক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী

রহ.-কে। তিনি নানাভাবে এ অনুবাদের জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছেন। *ইসলামি একাডেমি* পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক ও কথাসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় জনাব অধ্যাপক শাহেদ আলী ও ওই পত্রিকার ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক জনাব ফারুক মাহমুদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে তা নেহাত অকৃতজ্ঞতারই পরিচায়ক হবে। কেননা তাঁদের সম্পাদনায় প্রকাশিত *ইসলামি একাডেমি* পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম এ অনুবাদটি ছাপার মুখ দেখেছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য গঠিত 'ইসলামি শিক্ষা সংস্কার' প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মাদরাসা-শিক্ষাবোর্ডের সদস্যরূপে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ এছহাক সাহেবের (তিনিও ওই উভয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন) মূল্যবান সহযোগিতা পেয়ে এমনিতেই গৌরবান্বিত ছিলাম। এ পুস্তকের পরিচিতি লিখে দিয়ে তিনি আমার সে গৌরবকে আরও বর্ধিত করলেন।

সংশয়ের আবর্তে নিক্ষিপ্ত আধুনিক যুব-মানসের বিভ্রান্তি মোচন ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা সাধনে এ বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে মনে করেই ঐকান্তিক যত্নসহকারে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। অনুবাদকর্মে কতটুকু সফল হয়েছি, পাঠকের উপরই সেই বিবেচনার ভার রইল। অন্তর্যামী রাব্বুল আলামিন যদি তাঁর প্রিয় হাবিবের তোফায়েলে তাঁর এ দাসানুদাসের এই অতি সামান্য নজরানাটুকু কবুল করুন, তবেই আমার সব শ্রম ও সাধনা সার্থক।

–আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
১২ রবিউল আউয়াল,
১৩৯৫ হিজরি মোতাবেক,
১২ চৈত্র ১৩৮১ বাংলা

সাঈদ কুটির
সাং-টুকেরগাঁও,
ডাকঘর–টুকেরবাজার,
জেলা-সিলেট

সূচিপত্র

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী ১৭
প্রথম ভাষণ ২১
মানবতার পূর্ণতা বিধানে নবী-রাসুলগণের জীবনচরিত ২১
দ্বিতীয় ভাষণ..৩৫
মুস্তফা-চরিত বিশ্বজনীন ও শাশ্বত জীবনাদর্শ ৩৫
ঐতিহাসিকতা.. ৩৭
পূর্ণাঙ্গতা ৪২
ব্যাপ্তি ৪৬
বাস্তব রূপ ৫০
তৃতীয় ভাষণ..৫৩
মুস্তফা-চরিতের ঐতিহাসিকতা ৫৩
বিশ্বনবীর জীবনকালে সংকলিত জ্ঞানভান্ডার ৫৯
চতুর্থ ভাষণ ৭৫
মুস্তফা-চরিতের পূর্ণাঙ্গতা..৭৫
পঞ্চম ভাষণ.. ৯৫
মুস্তফা-চরিতের সর্বজনীনতা... ৯৫
ষষ্ঠ ভাষণ ১১৫
বাস্তবতার নিরিখে মুস্তফা-চরিত ১১৫
সপ্তম ভাষণ ১৪৩
ইসলামের নবীর পয়গাম...১৪৩
অষ্টম ভাষণ ১৬৫
মুহাম্মদ সা. যে পয়গাম দিয়ে গেলেন ১৬৫
দীন ও দুনিয়ার পৃথকীকরণ ১৮৬

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী

মুসলিমবিশ্বের অন্যতম সেরা দার্শনিক পণ্ডিত, বিশিষ্ট ইসলামের ইতিহাসবেত্তা, উর্দু সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ও খেলাফত আন্দোলন তথা ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রথম সারির নেতা আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী ১৮৮৪ ঈসায়ি সনের ২২ নভেম্বর মোতাবেক ১৩০২ হিজরির ২৩ সফর শুক্রবার বিহারের পাটনা জেলার অন্তর্গত দিসনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাকিম আবুল হাসান। স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ফুলওয়ারা শরিফ ও দ্বারভাঙ্গার মাদরাসা-ই-এমদাদিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর ১৯০১ সালে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত 'দারুল উলুম নদওয়া'য় ভর্তি হন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদও তখন নদওয়ার শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৯০৫ সালে আল্লামা শিবলির দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন। ১৯০৬ সালে তিনি নদওয়ার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। 'দস্তারবন্দি' অনুষ্ঠানে (কনভোকেশন) তাঁর অনবদ্য আরবি বক্তৃতা শুনে আল্লামা শিবলি তাঁর নিজের মাথার পাগড়ি খুলে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যের মাথায় পরিয়ে দেন।

১৯০৭ সালে আল্লামা শিবলি তাঁকে তাঁর মাসিক *আন-নদওয়া*র সহসম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৯০৮ সালে তিনি দারুল উলুম নদওয়ার আধুনিক আরবি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯১০ সালে আল্লামা শিবলি তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ *সিরাতুন নবী* রচনার কাজ শুরু করলে সাইয়েদ সুলাইমান নদবী তাঁর সহকারীরূপে কাজ করেন। *সিরাতের ু ন নবী*র মাত্র দুটি খণ্ডের রচনাকার্য শেষ না হতেই আল্লামা শিবলি ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে ইনতেকাল করেন। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ অনুসারে তাঁর সুযোগ্য শাগরেদ সাইয়েদ সুলাইমান নদবী *সিরাতুন নবী*র ওই দুই খণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন এবং অবশিষ্ট তিন খণ্ড নিজে রচনা করেন। ভুপালের বেগম সুলতান জাহান বেগম এবং হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যের নিজাম বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে রচিত তাঁর এই *সিরাতুন নবী* গ্রন্থ হচ্ছে নবীচরিত সংক্রান্ত পৃথিবীর বৃহত্তম পুস্তক। ওই বিশাল গ্রন্থের তিন খণ্ড এবং আল্লামা নদবীর রচিত *সিরাতে আয়েশা* (*আয়েশা চরিত*) তুর্কি ভাষাতেও অনূদিত হয়। *সিরাতুন নবী*র কয়েক খণ্ড ফারসি ভাষাতেও আফগানিস্তানে অনূদিত হয়।

১৯১৩ সালে তিনি মাওলানা আজাদের কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক *আল-হেলালে* যোগ দেন। ত্রিপলি ও বলকান যুদ্ধ উপলক্ষে

মুসলিম ভারত তখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষুব্ধ। এমন সময় কানপুরের একটি মসজিদের অংশবিশেষ ভেঙে রাস্তা বানানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত মুসলমানদের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে কিছুসংখ্যক মুসলমান শহীদ হলে মুসলিম ভারতে ক্ষোভ তখন দাবানলের রূপ নেয়। সাইয়েদ সুলাইমান নদবী *আল-হেলাল*-এর ১৯১৩ সালের ১২ আগস্টে প্রকাশিত তাঁর 'মাশহাদে আকবার' (শ্রেষ্ঠ শাহাদতগাহ) শীর্ষক প্রবন্ধ মারফত সেই আগুনে যেন ঘৃত সংযোগ করলেন। মুসলিম ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ব্রিটিশ সরকার *আল-হেলাল*-এর সে সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে।

আল্লামা শিবলি নোমানি দারুল মুসান্নিফিন (লেখক ভবন) প্রতিষ্ঠার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজের বাসভবনসহ আজমগড়ে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। কিন্তু তিনি তা বাস্তবায়িত করে যেতে পারেননি। তাঁর ইনতেকালের পর সাইয়েদ সুলাইমান নদবী দারুল মুসান্নিফিন বা 'শিবলি একাডেমি' নামে তা প্রতিষ্ঠা করেন। পুনার দাক্ষিণাত্য কলেজে অধ্যাপক থাকাকালে তাঁর রচিত দু খণ্ডে সমাপ্ত *আরদুল কুরআন* হচ্ছে 'দারুল মুসান্নিফিনের' প্রকাশিত প্রথম পুস্তক।

১৯১৫ সালে তিনি পুনায় অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দু'র বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। [১৯১৬ সালে তার প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র *মাআরেফ* 'দারুল মুসান্নিফিনে'র মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়, যা আজ অবধি জ্ঞানপিপাসুদের পিপাসা নিবৃত্ত করে চলেছে।] ১৯১৭ সালে তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙালা'র বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। ওই একই সময় কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগেরও অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

১৯১৯ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং তিনিই ছিলেন ওই আন্দোলনের প্রধান লেখক ভাষ্যকার। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় খেলাফত-প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্যরূপে বিলাত গমন করেন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. লয়েল জর্জের সাথে সাক্ষাত করেন। প্রতিনিধিদল ভারতীয় মুসলমানদের বক্তব্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং সেখানকার শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরেন। এ সময় ইউরোপ সফররত হেজাজি, সিরিয়ান ও মিসরীয় প্রতিনিধিদলের নেতা নুরী আস সাঈদ পাশা, মিসরীয় প্রতিনিধিদলের নেতা হাদ্দাদ পাশা এবং সা'দ জগলুল পাশার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা আবদুল করিম রিফির সাথেও এ সময় তাঁর একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি আর্নল্ড, ইজি ব্রাউন ও মারগোলিয়াথের মতো প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের সাথেও

সাক্ষাত করেন। জনৈক ইতালীয় প্রাচ্যবিদের সমালোচনার জবাবে তাঁর খেলাফত সমস্যাসংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ সাময়িকী *Foreign Affairs*-এ প্রকাশিত হয়। এ সময় তাঁর ফ্রান্স ও ইতালি ভ্রমণেরও সুযোগ ঘটে।

১৯২৫ সালে খেলাফত প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে তিনি হেজাজ গমন করেন। দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন স্বনামধন্য আলী ভ্রাতৃদ্বয়–মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী এবং মি. শোয়েব কুরাইশি। এ সময় সুলতান আবদুল আজিজ ইবনে সউদ মক্কা শরিফে একটি বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন (মুতামার) আহ্বান করেন। আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী এর ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সম্মেলনের সভাপতি সৌদি প্রধানমন্ত্রী হাফিজ ওয়াহবার অনুপস্থিতিতে তিনি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে তিনি এলাহাবাদের 'হিন্দুস্তানি একাডেমির' উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে 'ইন্দো-আরব সম্পর্ক' বিষয়ে কয়েকটি স্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন, যা পরে পুস্তকাকারে উর্দু ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ওই ভাষণ প্রদানকালে পণ্ডিত জওয়াহারলাল নেহরুও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আল্লামা নদবীর ওই জ্ঞানগর্ভ ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯৩০ সালে সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ সম্মেলনে পঠিত তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ *খৈয়াম* বিশ্বজোড়া পণ্ডিত-সমাজের প্রশংসা অর্জন করে। তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিশ্বকবি ফেরদৌসির সহস্রতম বার্ষিকী উপলক্ষে ইরানে প্রেরিত আফগান উপহারসামগ্রীসমূহের মধ্যে আল্লামার ওই *খৈয়াম* পুস্তকটি ছিল অন্যতম।

১৯৩৩ সালে হায়দারাবাদের নিজাম সরকারের অনুরোধে তিনি 'হানাফি ল' আধুনিক আঙ্গিকে আইন পুস্তকাকারে বিন্যস্ত করেন। ওই বছরই অক্টোবর মাসে তিনি আফগান বাদশাহ নাদির শাহের আমন্ত্রণে শিক্ষা-ব্যাপারে আফগান সরকারকে পরামর্শদানের জন্য কাবুল যান। ড. স্যার ইকবাল এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলরও অনুরূপ আমন্ত্রণ পেয়ে সে সময় কাবুল গিয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালে তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় প্যালেস্টাইন কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণরূপে প্রদত্ত তাঁর আরবি ভাষণ মিসর ও সিরিয়ার পত্রপত্রিকায় হুবহু প্রকাশিত হয় এবং আরব দেশসমূহের প্রভূত প্রশংসা কুড়ায়। মুফতিয়ে আজম ফিলিস্তিন আলহাজ সাইয়েদ আমিনুল হুসায়নি এ জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা প্রেরণ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি 'নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সের' আলীগড়ে অনুষ্ঠিত

স্বর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের ‘ইসলামিক আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স’ বিভাগের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট (Doctorate of literature) উপাধি প্রদান করেন। ওই সালেই তিনি হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাওলানা থানবী তাঁর এই শিষ্যের জন্য রীতিমতো গর্ববোধ করতেন। ভোপালের নবাব হামিদুল্লাহর আমন্ত্রণে এবং তৎকালীন ভোপালি মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য মি. শোয়েব কুরায়শির একান্ত অনুরোধে ১৯৪৬ সালের জুন মাসে তিনি ভোপাল রাজ্যের কাজি-উল-কুজাত (প্রধান বিচারপতি)-এর পদ অলংকৃত করেন। এ সময় তিনি ভোপালের ‘জামেয়া মাশরেকির’ (Oriental University) চ্যান্সেলর পদও গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সস্ত্রীক হজ করতে যান। হেজাজে তিনি বাদশাহ ইবনে সউদের সম্মানিত অতিথিরূপে গণ্য হন। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং করাচিতে বসবাস করতে শুরু করেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বারবার তাঁকে আলীগড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালানো হয়। ড. জাকির হোসেন (পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি) ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর তিনি নিজেও আল্লামা সুলাইমান নদবীর মতো সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য পুন:পুন: চেষ্টা করেন, কিন্তু আল্লামা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৫৩ সালের ২২ নভেম্বর (ঠিক জন্মের তারিখেই) ৬৯ বছর বয়সে তিনি করাচিতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ থেকে শুরু করে মিস ফাতিমা জিন্নাহ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, সরদার আবদুর রব নিশতারসহ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। পাকিস্তান গণপরিষদের স্পিকার মৌলভি তমিজুদ্দিন খান এবং সিরিয়া, ইরাক ও মিসরের রাষ্ট্রদূতগণ আল্লামার কফিন বহন করে নিজেদের গৌরবান্বিত করেছিলেন। করাচির দৈনিক *ডন* ও উর্দু দৈনিক *জংগ*, লাহোরের দৈনিক *নাওয়ায়ে ওয়াক্ত*, দিল্লির দৈনিক *আলজমিয়ত* প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

প্রথম ভাষণ

মানবতার পূর্ণতা বিধানে নবী-রাসুলগণের জীবনচরিত

বিচিত্র এই বিশ্বজাহান! এখানে রয়েছে নানা ধরনের সৃষ্ট বস্তু ও জীবজন্তু। তাদের প্রত্যেকেই আবার ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জড়পদার্থ থেকে নিয়ে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের অনুভূতি, বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দিন দিন বিকশিত হয়ে চলেছে। জড়পদার্থের প্রাথমিক স্তর অণু-পরমাণু ও ইথার প্রভৃতি সর্বপ্রকারের অনুভূতি বোধ ও ইচ্ছাশক্তি-বিবর্জিত। জড়পদার্থের অন্যান্য স্তরে জীবনের অল্পবিস্তর আভাস পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমবর্ধনের মধ্যে উদ্ভিদাদির ইচ্ছাশক্তিরহিত অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটে। জীবজন্তুর মধ্যে অনুভূতির সাথে সাথে ইচ্ছাশক্তিও সক্রিয়ভাবে বিরাজমান আর মানুষের মধ্যে তো এ তিন শক্তিই পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। এই শক্তিত্রয়ই আমাদের দায়িত্বশীলতার মূল কারণ। সৃষ্টির যে শ্রেণি বা স্তরের এই শক্তিত্রয়ের যতটুকু অভাব রয়েছে, সেই শ্রেণি বা স্তরই ইচ্ছানির্ভর দায়িত্বভার থেকে ঠিক ততটুকু মুক্ত। জড়পদার্থসমূহের আদৌ কোনো দায়িত্ব নেই। উদ্ভিদাদির মধ্যে জীবন-মরণের কিছুটা দায়িত্ব বর্তায়। জীবজন্তুর দায়িত্ব আরও একটু বেড়ে যায়; আর মানুষ তো আষ্টেপৃষ্ঠে দায়িত্ববন্ধনে বাঁধা। আবার অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে মানুষের মধ্যেও প্রকারভেদ রয়েছে। একদিকে রয়েছে বিকৃত মস্তিষ্ক, উন্মাদ, নির্বোধ ও শিশু-বাচ্চার দল, অপর দিকে রয়েছেন বুদ্ধিমান, বয়স্ক, সচেতন, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবানদের সমাজ। এই অনুভূতি বোধ ও ইচ্ছাশক্তির আধিক্য-স্বল্পতা অনুসারেই এদের কেউ সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত, কারও দায়িত্ব স্বল্প, আবার কারও দায়িত্ব অধিক।

অপরদিকে লক্ষ করুন, সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যাদের এই শক্তিত্রয়ের যতটুকু অভাব রয়েছে, প্রকৃতি তাদের প্রতিপালনের দায়িত্বভার ঠিক ততটুকুই নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে। আবার সৃষ্ট বস্তুর চক্র যতই খুলতে থাকে, ওই শক্তিত্রয়ের পরিমাণ অনুসারে তার দায়িত্বভারও ততই প্রকৃতি তাদের কাঁধে অর্পণ করতে থাকে। পর্বতাভ্যন্তরস্থ হীরা-চুনি, স্বর্ণ-মুক্তা, জমরুদ-ইয়াকুতাদির প্রতিপালন কে করে? সামুদ্রিক মৎস্যাদির প্রতিপালনের ভার কার উপর? বন্য পশ্বাদির লালন-পালনের চিন্তাভাবনা কে করে? রোগভোগ ও শীত-গ্রীষ্মে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গাদির দেখাশোনা কার উপর নির্ভরশীল? শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের জীবজন্তু এবং বনজঙ্গল-পাহাড়-পর্বত মরুভূমির জীবজন্তু একই জাতীয় প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও আবহাওয়ার বৈচিত্র্যের দরুন তাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইউরোপীয় ও আফ্রিকান কুকুরের আবহাওয়াগত গরমিলের দরুন নৈসর্গিক প্রয়োজনের মধ্যেও যে গরমিলটুকু রয়েছে তার পরিপূরণের ব্যবস্থাও কুদরত বা প্রকৃতি নিজ হস্তে করে থাকে। আর এ জন্যই বিভিন্ন আবহাওয়ায় প্রতিপালিত জীবজন্তুর থাবা, চর্ম-লোম, বর্ণাদিতে এত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আপনারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারেন যে অনুভূতি, বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির যেখানেই যতটুকু অভাব রয়েছে, কুদরত সেখানেই নিজ হস্তে সে অভাব পূরণের বন্দোবস্ত করে থাকে। আর সৃষ্ট জীবজন্তুগুলো যতই পূর্ণতার পথে এগিয়ে যায়, প্রকৃতি তাদের ভরণপোষণের ভার তাদের নিজ নিজ শক্তির উপর ছেড়ে দিয়ে ততই দূরে সরতে থাকে। মানুষকে তার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিজেকেই প্রস্তুত করতে হয়। তাকে হালচাষ ও বৃক্ষরোপণের কষ্ট স্বীকার করতেই হয়। শীত-তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে দেওয়া হয়নি প্রাকৃতিক চর্মলোমাদি। নানা ধরনের বস্তু নিজ হস্তে প্রস্তুত করেই তাকে এ প্রয়োজন মেটাতে হয়। রোগভোগ, বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে নিজেকেই সচেষ্ট হতে হয়।

অপরদিকে লক্ষ করুন, যেখানেই অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির যতটুকু দুর্বলতা বা অভাব রয়েছে, প্রকৃতি সেখানেই সৃষ্টিকে রক্ষার ততটুকু দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রাণীকে তার আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর কাউকে সুতীক্ষ্ণ থাবা বা ধারালো দাঁত, কাউকে শিং, কাউকে ওড়া ও সাঁতার কাটার শক্তি বা দ্রুতগতি, আবার কাউকে বিষাক্ত হুল বা দাঁত দিয়ে প্রকৃতি অস্ত্রসজ্জিত করে রেখেছে।

কিন্তু বেচারা মানুষকে আত্মরক্ষার জন্য হাতির প্রকাণ্ড দাঁত বা শুঁড়, বাঘের সুতীক্ষ্ণ থাবা ও দাঁত, ষাঁড়ের শিং, কুকুর বা সাপের বিষদাঁত, বিচ্ছু বা বোলতার বিষাক্ত হুল বা তদনুরূপ কোনো প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়নি। মোটকথা, বাহ্যিকভাবে সব দিক দিয়েই তাকে অত্যন্ত নিরস্ত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে অনুভূতি ও বোধশক্তি বৃদ্ধি করে ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে। আর এই অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ তার সর্বপ্রকারের বাহ্যিক দুর্বলতার প্রতিকার করে থাকে। সে তার এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা প্রকাণ্ড দাঁত ও শুঁড়বিশিষ্ট বিশাল বপু হাতিকে পরাস্ত করে। সুতীক্ষ্ণ থাবা ও দন্তধারী ব্যাঘ্রকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়, মারাত্মক বিষধর সর্পকে বন্দি ও সামুদ্রিক মৎস্যাদিকে জালে আবদ্ধ করে। সে তার আত্মরক্ষার জন্য শতসহস্র রকমের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে।

আপনারা যেকোনো ধর্ম বা দর্শনের অনুসারী হোন না কেন, অনুভূতি, বোধশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং ইচ্ছাশক্তিই যে মানুষ হিসেবে আপনাদের সকল দায়িত্বের মূল কারণ, এ কথা আপনাদের স্বীকার করতেই হবে। ইসলামের পরিভাষায় এই দায়িত্বভারকেই ‘তকলিফ’ বলে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যের অনুপাতেই এই তকলিফ বা দায়িত্বভার অর্পিত হয়। ইসলাম ধর্মানুসারে আল্লাহর নির্দেশিত মূলনীতি হলো :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কারও উপর তার সামর্থ্যাতীত ‘তাকলিফ’ (দায়িত্বভার) চাপিয়ে দেন না। (বাকারা, ২:২৮৬)

এই দায়িত্বভারকেই কুরআনের অন্য এক স্থানে ‘আমানত’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ‘আমানতের বোঝা’ জড়পদার্থ, উদ্ভিদাদি, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, এমনকি বিশাল পর্বতাদি, সুউচ্চ গগনমণ্ডলীর সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এদের কেউই তা বহনে সমর্থ হয়নি।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ

আমি আসমান-জমিন পর্বতরাজির সম্মুখে আমানত পেশ করছি কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঘাবড়ে গিয়েছে। অতঃপর মানুষ সে বোঝা মাথা পেতে নিয়েছে, নিঃসন্দেহে সে জালিম, গোঁয়ার। (আহযাব ৩৩:৭২)

কবির ভাষায় :

اسمان بار امانت نتوانست کشید ہ فال بنام من دیوانہ زوند

অর্থাৎ, আমানতভার উঠাতে যা আকাশ ব্যর্থকাম,
ফালে উঠিয়াছে তাহাই বহিতে–আমি পাগলের নাম। –হাফিজ

এই 'জালিম' ও 'গোঁয়ার' শব্দ দুটি দিয়ে প্রেমের পাগলই বোঝানো হয়েছে। 'জালিম' বা সীমা লজ্ঘনকারী শব্দ দিয়ে কার্যক্ষেত্রে মানুষের অমিতাচারিতা এবং 'জহুল' বা গোঁয়ার শব্দের বিশেষণ দিয়ে তার বুদ্ধিগত অমিতাচারের কথাই বোঝানো হয়েছে। জালুম বা জালিমের বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'আদিল' এবং জহুলের বিপরীত শব্দ 'আলিম'। এই দুই বিশেষণে ভূষিত হতে হলে মানুষের কার্যক্ষেত্রে 'আদল' বা মধ্যম পন্থা এবং মানসিক ক্ষেত্রে 'ইলম' বা জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। কুরআনের পরিভাষায় 'আদল'-এর অন্য নাম হচ্ছে 'আ'মালে-সালেহ' বা সৎকর্ম এবং ইলমের অপর নাম 'ইমান'।

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

কালের শপথ, নিঃসন্দেহে মানব ক্ষতিগ্রস্ত; অবশ্য যারা 'ইমান' আনয়ন করেছে এবং আমালে সালেহ বা সৎকর্মাদি করেছে তারা নয়। (আসর, ১০৩:১-৩)

এখানে 'খুসর' বা ক্ষতি শব্দ দ্বারা সেই কর্মে অমিতাচার (জুলুম বা সীমা অতিক্রম) এবং জ্ঞানের গোঁয়ার্তুমিকেই (জাহ্ল) বোঝানো হয়েছে এবং 'ইমান' বা সত্যজ্ঞান ও 'আদল' (মিতাচার) বা সৎকর্মকেই এ ব্যাধির ওষুধ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইমান এবং সৎকর্ম অর্জন না করা পর্যন্ত মানুষ নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসে নিপতিত, তার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা 'আসর' বা কালের নাম উল্লেখ করেছেন। 'আসর' বলতে এখানে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলি, বিপর্যয় ও ধ্বংসাবশেষগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। কার্লাইলের ভাষায় : 'ইতিহাস শুধু বড়লোকের জীবন-কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।' কালের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করেছে যে ইমান ও সৎকর্ম। (আমালে সালেহ) থেকে বিচ্যুত জাতিসমূহ ও ব্যক্তিবর্গ চিরদিনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

দুনিয়ার সমস্ত আসমানি কিতাব, ধর্মীয় গ্রন্থাদি, নীতিকাহিনি ও মানবজাতির ভাঙাগড়ার ইতিহাস এই 'জুলুম' ও 'জাহ্ল' (কর্ম ও চিন্তার অমিতাচার) এবং ইমান ও আমালে সালেহের (সৎকর্ম) দ্বিবিধ রঙেই অনুরঞ্জিত। একদিকে অমিতাচার (জুলুম ও জেহেল) তথা অমঙ্গল,

অন্ধকারের কাহিনি এবং অপরদিকে মিতাচার (আদল), সৎকর্ম (আমালে সালেহ) তথা মঙ্গল ও আলোর ইতিকাহিনি। যারা ওপরে বর্ণিত মানবীয় দায়িত্বগুলো গ্রহণ করে তা পালন করে গিয়েছেন, তাদের প্রশংসা এবং যারা এ দায়িত্ব পালনে নারাজ হয়েছেন তাদের নিন্দাবাদ এবং মন্দ পরিণতির বিবরণই এই সমস্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রিক *ইলিয়াড*, রোমান *প্যারালাল লোজ*, ইরানি *শাহনামা*, ভারতীয় *মহাভারত*, *রামায়ণ* ও *গীতা* কীসের বিবরণ? প্রত্যেক জাতির নিকটই তাদের মহাপুরুষদের জীবনেতিহাসের জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, মিতাচার, অমিতাচার, সৎকর্ম ও অপকর্ম এবং ইমান ও কুফরের সংঘাত-সংঘর্ষের শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ মজুদ রয়েছে, যাতে করে প্রত্যেক জাতি অমিতাচার, অপকর্ম ও কুফরের ভয়াবহ পরিণতি থেকে আত্মরক্ষা করে মিতাচার, সৎকর্ম এবং ইমানের সুফল থেকে উপকৃত হতে সচেষ্ট হয়।

সীমালঙ্ঘনকারী, অবাধ্য, কাফির ও মন্দ প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ ও জাতিসমূহের সর্বনাশ ও মিতাচারী, সৎকর্মশীল ও মুমিন ব্যক্তিবর্গ এবং জাতিসমূহের সাফল্যের বিজয়গাথা ও সুন্দর উদাহরণই তাওরাত, যবুর, ইনজিল ও কুরআনের আলোচ্য বিষয় নয় কি? যাতে করে 'জালিম' 'আদিল' হয় তথা অমিতাচারী মিতাচারে, মন্দলোক সৎকাজে অভ্যস্ত হয় এবং 'কাফির' 'মুমিনে' পরিণত হয়ে যায়। এই জন্যই খাতেমুন নবীয়্যিন আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রত্যেকটি জাতি তথা জাতির সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক জাতির কাছেই আল্লাহর প্রেরিত মনীষীবৃন্দ তথা নবী-রাসুলগণ নিজেদের অনুকরণীয়-অনুসরণীয় আদর্শ চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন; এবং সর্বশেষে সর্বজনীন আদর্শের প্রতীকরূপে রহমাতুল্লিল আলামিন বা গোটা বিশ্বজাহানের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ দিয়ে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে :

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٦

> হে কোরাইশ জাতি, (নবুওয়াতের দাবি করার পূর্বে) আমি তোমাদেরই মধ্যে জীবনের এক বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছি। তোমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? (ইউনুস ১০:১৬)

প্রকৃত প্রস্তাবে এই পবিত্র আয়াতে আল-কুরআন তাঁর (নবীর) পুণ্য জীবনচরিতকেই তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছে।

বিশ্ব-ইতিহাসে এমন লক্ষ লক্ষ প্রথিতযশা ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, যাঁরা নিজেদের জীবনকে ভাবী বংশধরদের কাছে আদর্শস্বরূপ পেশ করে গেছেন। প্রবল পরাক্রমশালী রাজা-মহারাজা, সিপাহসালারবর্গ, পণ্ডিত-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকবৃন্দ, বিশ্ববিজয়ী অভিযাত্রীদল, যুগস্রষ্টা কবি-মহাকবি ও অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী ব্যক্তিদের আকর্ষণীয় জীবনকথা সর্বদাই মানবমনকে তাঁদের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে। কার্থেজের হ্যানিবল, মেসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার, রোমের সিজার, ইরানের দারা ও ফ্রান্সের নেপোলিয়নের রোমাঞ্চকর জীবনেতিহাস মানুষের জন্য চিত্তাকর্ষক। সক্রেটিস, আফলাতুন (Plato), আরাস্তু (Aristotle), দিওজিনাস প্রমুখ গ্রিক দার্শনিক থেকে শুরু করে স্পেন্সার পর্যন্ত প্রত্যেকের জীবনেই একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক অত্যন্ত পরিস্ফুট। নমরুদ-ফেরাউন এবং আবু জাহল-আবু লাহাবের জীবনে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারুনের জীবনী এক সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মোটকথা, কত অঙ্কে কত নায়কেরই না আবির্ভাব ঘটেছে দুনিয়ার এই রঙ্গমঞ্চে! রকমারি তাঁদের অভিনয়। আর এই সবই আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। কিন্তু বলুন দেখি, এ বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনাবলির কোনটি মানবজাতির শান্তি, সাফল্য ও পথের দিশা (হেদায়েত) লাভের নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষম এবং অনুকরণ ও অনুসরণের আদর্শ?

বিশ্ববিজয়ী ও বিশ্বত্রাস সিপাহসালার-অভিযাত্রীও তাঁদের মধ্যে রয়েছেন; কিন্তু মানবজাতির পথের দিশা ও সাফল্য লাভের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে কি তাঁরা সমর্থ হয়েছেন? তাঁদের তলোয়ারের হীরকধার কি যুদ্ধক্ষেত্র অতিক্রম করে মানবসমাজে প্রচলিত কুসংস্কারাদিরূপ শিকল ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছে? মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে বা মানবজীবনের কোনো সুষ্ঠু সূত্রদানে কি তাঁরা সমর্থ হয়েছেন? আমাদের আধ্যাত্মিক নৈরাশ্যের কোনো প্রকার প্রতিষেধক প্রদানে, অন্তরের কলুষতা-মরিচা স্খলনে বা আমাদের নৈতিক ও কর্মজীবনের কোনো কর্মসূচি প্রণয়নে কি তাঁরা সক্ষম হয়েছেন?

বিশ্বজগতে কত কবি-মহাকবির জন্ম হয়েছে। কিন্ত কল্পনাজগতের এই সম্রাটগণ বাস্তব জগতে বিলকুল ব্যর্থই প্রতিপন্ন হয়েছেন। আফলাতুন তাঁর প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় বিধানে এদের কোনো স্থান দেননি। হোমার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এসব কবি-সাহিত্যিক সাময়িক উত্তেজনা ও কাল্পনিক সুখ-দুঃখ

সৃষ্টি ব্যতিরেকে মানবজাতির স্থায়ী সমস্যাগুলোর সমাধানের ব্যাপারে কোনো নির্ভুল পরামর্শ দিতে পারেনি। কেননা, এদের কোকিল কণ্ঠের পেছনে বাস্তব জীবনের কোনো মনোমুগ্ধকর নমুনার প্রেরণা ছিল না। তাই কুরআনে পাকে বলা হয়েছে :

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ.

আর পথভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। তুমি কি লক্ষ করো না যে তারা প্রত্যেক মাঠেই বিচরণ করে এবং তারা যা বলে, তা করে না–অবশ্য যারা ইমান আনয়ন করেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা নয়। (শুআরা ২৬:২২৪-২২৭)

তাঁদের সুমধুর ভাষার প্রভাব না থাকার দার্শনিক কারণও কুরআন নির্দেশ করেছেন : তারা কল্পনার মাঠে বিচরণ করে বেড়ায় এবং ইমান ও সৎকর্ম তাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু ইমান ও আমালে সালেহ বা সৎকর্মের বিবিধ সম্পদে সমৃদ্ধ কবির কথায় অবশ্যই কিছু না কিছু ফলোদয় হয়ে থাকে। তবে ইসলাহ ও হেদায়েত তথা সংস্কার-সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের মহান দায়িত্ব পালনে যে কবিরা অপারগ, স্বয়ং বিশ্ব-ইতিহাসই এর সাক্ষ্য বহন করছে।

আপন বুদ্ধির জোরে যাঁরা বারবার সৌরজগতের নকশা পরিবর্তন করেছেন, বিশ্বের যতসব আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ব্যাপারের করেছেন রহস্য উদ্‌ঘাটন, মানুষের হেদায়েতের বাস্তব কর্মসূচি প্রণয়ন ও মানবীয় দায়িত্বাবলির রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা, তাঁদের সূক্ষ্ম দর্শন ও আকাশচারী চিন্তা-দর্শনের পেছনে সৎকর্মের কোনো আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় না। আরাস্তুকে নীতিশাস্ত্রের জনক বলা হয়ে থাকে। বিশ্বের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাঁর নীতিশাস্ত্রের (Ethics) উপর অধ্যাপকেরা উন্নত ধরনের ভাষণ দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম দর্শনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়। কিন্তু বলুন তো দেখি, এগুলো শুনে বা পড়ে কয়জন মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন বা সঠিক পথে চলতে শিখেছেন? বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিশাস্ত্র রয়েছে এবং সাথে সাথে সুযোগ্য অধ্যাপকেরাও রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নীতিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলোর প্রভাব কি কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে বা এমন আশাও কি কোনো দিন করা যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের